রক্তচোষা

অজেয় রায়

BENGALIEBOOK.COM
BE
bengaliebook.com
বেঙ্গলিইবুক.কম
★2022★

রক্তচোষা

গ্রীষ্মের ছুটির শেষ দিক। আমি আর সুনন্দ বেড়াতে গেলাম ঘাটশিলায়।

সুনন্দর মামার একটা বাড়ি আছে ঘাটশিলায়। কেউ বড় যায়-টায় না। বন্ধই থাকে। বারোমাস। একজন মালি বাড়ি আগলায়। সুতরাং ইচ্ছে ছিল নির্বিঘ্নে আড্ডা মারব। এ বেড়াব। আমরা দুজনে কলেজে পড়ি। বেজায় বন্ধ। কলকাতার ভিড় আর হট্টগোল ছেড়ে এমন খোলামেলা প্রকৃতিরাজ্যে এসে মন আমাদের উড়তে লাগল।

ঘাটশিলা শহরটি তকতকে পরিষ্কার। বাড়িঘর লোকজনের ঘেঁষাঘেষি নেই। শহরের বাইরে চারপাশে ধু-ধু পাথুরে মাঠ। কোথাও শাল বন। একধারে পরপর কতগুলো জঙ্গলে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়। শহরের পাশ দিয়ে গেছে সুবর্ণরেখা নদী। চওড়া নদীখাতের ভিতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাইয়ের ফাঁকে হু-হুঁ করে জল ছুটে চলেছে। সুবর্ণরেখা ছাড়াও কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ি নদী আছে ধারে কাছে।

সুনন্দর মামার বাড়িটা শহরের প্রায় বাইরে একটু নির্জন অংশে। ধলভূমগড় যাবার পিচ বাঁধানো চওড়া রাস্তাটা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেছে। এই পথ শহর ছাড়িয়ে, প্রান্তর ভেদ করে, শালবনের গা ছুঁয়ে দূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। তখন একটু একটু বর্ষা নেমেছে। গরম কমেছে। যদিও দিনের বেলা চড়া রোদ ওঠে, আমাদের কিন্তু পরোয়া

নেই। দুটো সাইকেল জোগাড় করে দিনের বেলা টো-টো করে ঘুরে বেড়াই। রাতে বিছানায় শুয়ে শুনতে পাই হায়নার এ্যাক-খ্যাক হাসি। মালির বউ লছমি রান্না করে দেয়। ভাত-ডাল-তরকারি সে মোটামুটি রাঁধে। কিন্তু মাছ-মাংস নিজেরাই বানাই।

ভোরবেলা প্রায়ই হাজির হয় বুধন মাঝি। কোনোদিন সে আনে তাজা ফলমূল, মাছ। মুরগি বা ডিম। কোনোদিন মধু। কখনও বা কলসি ভরা টাটকা খেজুর রস।

বুধন মাঝি সাঁওতাল। মাঝবয়সী। আমাদের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেছে। ও থাকে মাইল তিন-চার দূরে এক গ্রামে। গ্রামের নাম মহুয়াডাঙা। বুধন ঘাটশিলার বাজারে জিনিস বিক্রি করতে যায়। পথে আমাদের বাড়িতে বসে প্রায়ই খানিক গল্প করে নেয়। লোকটি চায়ের ভক্ত। চায়ের সময় এলে আমরা ওকে চা অফার করি। বুধন লাজুক লাজক মখে চক্ষ মুদে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

মোটামুটি একই ছাঁদে কাটছিল দিনগুলো। হঠাৎ ঘটনার মোড় গেল ঘরে।

একদিন বর্ধন এল ভোরে। কয়েকটা ডিম এনেছে বিক্রি করতে। লক্ষ করলাম, তার ভারি বিষণ্ণ। সুনন্দ ঠাট্টা করল,–কি বুধন, মুখ ব্যাজার কেন, বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। বুঝি?

বুধন মাথা নাড়ল। তারপর কেমন ঝিম মেরে বসে রইল।

বুঝলাম, ব্যাপার কিছু গুরুতর। হয়তো ওর বাড়িতে কারো অসুখ-বিসুখ করেছে। আমি সহানুভূতি দেখাই–বুধন, বলো শুনি হয়েছেটা কী!

বুধন মুখ তুলে করুণ সুরে বলল, বাবু, আমার ভাইটারে মেরে ফেলবে। ঠিক মেরে ফেলবে।

সে কি! বুধনের এক ছোটভাই আছে শুনেছিলাম। তার বেশি কিছু জানতাম না। কিন্তু তাকে মারবে কে? কেন?

একটু একটু করে বুধনের কাছ থেকে উদ্ধার করলাম সমস্ত ঘটনা। এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য কাহিনি। মহুয়াডাঙায় নাকি রক্তচোষার আবির্ভাব ঘটেছে। মানুষের রক্তলোভী কোনো নিশাচর প্রাণী। আর গ্রামের লোকের সন্দেহ, বুধনের ভাই হচ্ছে এই রক্তচোষা।

ঘটনার শুরু চারদিন আগে। মহুয়াডাঙায় এক উৎসব ছিল। রাত করে সবাই নাচ গান। করেছে। তারপর যে যেখানে পারে শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ। অনেকে ছুটে আসে। বোকামাঝির বউ জামফুল চেঁচাচ্ছে। কোলে তার চার বছরের ছেলে। সবাই .দেখল, বাচ্চাটির গলার পাশ দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়ছে। গলায় ক্ষতচিহ্ন। এক চিলতে চামড়া যেন গোল করে কেটে নেওয়া হয়েছে। আর তলায় মাংসের মধ্যে ছোট্ট গর্তের মত ফুটো। ক্রমাগত রক্ত বেরিয়ে আসছে ওই ক্ষত থেকে।

জামফুল বলল যে, সে আর তার ছেলে ঘুমোচ্ছিল ঘরের দাওয়ায়। হঠাৎ ছেলের কান্না শুনে উঠে দেখে এই কাণ্ড।

এ কীসের কামড়? সবাই পরামর্শ করল। ইঁদুর? ছুঁচো? সাপ-টাপ? উঁহু, ওসব নয়। অভিজ্ঞ লোকেরা কাটা জায়গা পরীক্ষা করে জানাল। তবে কি কোনো পোকা-মাকড়? কেউ সঠিক বুঝতে পারে না। যাহোক ন্যাকড়াপোড়া চাপা দিতে রক্ত বন্ধ হল।

জামফুল আর একটা খবর দিয়েছিল। সে নাকি ছেলের কান্নায় ঘুম ভেঙেই দেখে বুনো। সামনে দিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে।

সেদিন কেউ বুনোকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি। বুনো সম্বন্ধে গ্রামের লোকের সন্দেহ জাগল আরও দুদিন পরে। অর্থাৎ গত পরশু রাতে।

ঢেঙ্গা মাঝি বুনোর প্রতিবেশী। ঢেঙ্গা ঘুমিয়েছিল তার খড়ের চালার নিচে খাঁটিয়া পেতে। একসময় ঘুম ভেঙে ঘাড়ে হাত দিয়ে বোঝে চটচটে কী যেন! দেশলাই জ্বেলে দেখে, রক্ত বেরোচ্ছে। গায়েও শুকনো রক্ত লেগে আছে। সেই একই রকম ক্ষতচিহ্ন। রক্ত যেন থামতে চায় না।

গ্রামের লোক আর ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারল না। কোনো চেনা জীব-জন্তুর দাঁত বা নখের দাগ নয়। তাদের ধারণা হয়েছে এ নিশ্চয়ই কোনো পিশাচ বা দানোর কীর্তি। সে ঘুমন্ত মানুষের দেহ ফুটো করে রক্ত চুষে নিচ্ছে। কে করতে পারে একাজ? একটা বিশেষ কারণে সবার বুনোর ওপর নজর পড়ল।

বুধনের ভাই নামে বুনো, স্বভাবেও বুনো। সে ছোটবেলা থেকে বাউণ্ডুলে। একরোখা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। কতবার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মাসের পর মাস পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরেছে। কাজকর্ম চাষবাসে মন নেই। যত অদ্ভুত বিদ্যে শেখার ঝোঁক। ওঝাদের কাছে সাকরেদি করে মন্ত্র-তন্ত্র তুকতাক শিখেছে অনেক। অতি বদরাগী। কারোর সঙ্গে সদ্ভাব নেই। বুধনের সঙ্গেও নয়। ঢেঙ্গার সঙ্গে বুনোর কদিন আগে ঝগড়া হয়েছিল। দুজনের বাড়ির সীমানায় একটা কলগাছের দখল নিয়ে বুনো ঢেঙ্গাকে শাসিয়েছিল। ঢেঙ্গা বলেছে, যখন তার বউ ঢেঙ্গার ঘাড়ের রক্ত বন্ধ করতে ব্যস্ত, তখন সে দেখেছে, তার উঠোনে বুনো দাঁড়িয়ে। তার বাড়িতে এত রাতে বুনো এসেছিল কী করতে?

গ্রামের লোক আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাদের মতে, রাতের বেলা বুনো নিশ্চয়ই দানো হয়ে মানুষের রক্ত চুষে খায়। গ্রামের মোড়ল বুনোকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে, সে দারুণ চটে যায়। বলে মিছিমিছি সবাই তার পিছনে লাগছে। এ ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই। ঢেঙ্গার চিৎকার শুনে সে দেখতে গিয়েছিল ব্যাপারটা কী। কিন্তু গ্রামের লোকের বিশ্বাস হয়নি বুনোর কথা।

ফুসফাস গুজগাজ আরম্ভ হয়েছে। বুনোই দায়ী। এ বুনোর কাজ। মহুয়াডাঙর মানুষগুলোকে সে এবার মেরে ফেলবে। ও আর মানুষ নেই। দানো হয়ে গেছে। কেউ বলছে, তাড়িয়ে দে গাঁ থেকে। কেউ বলছে মেরে ফেল, পিটিয়ে।

গল্প শুনে আমরা থ। এমন কাণ্ড সম্ভব!

আমি প্রশ্ন করলাম, সত্যি বুনো এরকম কাজ করতে পারে নাকি? তুই জানিস?

বুধন বলল, আমি আড়ালে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে। বুনো বলেছে, আমি করি নি। মনে হল ও মিছে কথা বলছে না।

সুনন্দ বলল, বুধন তোর ভাইকে কিছু দিনের জন্যে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বল। একবার যখন সন্দেহ ঢুকেছে মাথায়, বারবার এরকম হলে, হয়তো মরিয়া হয়ে গ্রামের লোক বুনোকে খুন করে বসবে।

বুধন হতাশভাবে বলল, বলেছিলাম তাই। বুনো যাবে না।

–কেন?

–ওই মেয়েটার জন্যে।

–কে মেয়ে?

বুধন বলল, বুনো বিয়ে করেছিল। বউ মরে গেছে। কিন্তু পাঁচ বছরের একটি মেয়ে আছে তার। মেয়েটি হতভাগ্য পঙ্গু। বছর দেড়েক আগে পড়ে গিয়ে তার ডান পায়ে চোট লাগে। তারপর পাটা ক্রমশ শুকিয়ে সরু হয়ে যাচ্ছে। জোর নেই পায়ে। প্রায় সব সময়। শুয়ে থাকে। বসে-বসে হাতে ভর দিয়ে হিচঁড়ে-হিঁচড়ে কোনোরকমে একটু-আধটু নড়াচড়া করে। ওকে নাইয়ে খাইয়ে দিতে হয়। এক বুড়ি তার দেখাশোনা করে।

মেয়ের ওপর বুনোর প্রচণ্ড টান। মেয়ের জন্যই সে আজকাল বাড়ি ছেড়ে দুরে যায় না। দুনিয়ায় একমাত্র এই মানুষটিকেই সে ভালবাসে। বুনোর ভয়, সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে। তার মেয়েকে মেরে ফেলবে লোকে। বুধনকেও তার বিশ্বাস নেই। আবার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে কোথাও গেলে, খোঁড়া মেয়েকে রাখবে কোথায়? সে সারাদিন মজরি খাটতে গেলে, মেয়ের যত্ন করবে কে? সুতরাং সে জেদ ধরেছে, গ্রামেই থাকবে। তাতে যা চা হোক।

আমি ও সুনন্দ মাথা ঘামাতে শুরু করলাম।

বুনো যতই একগুঁয়ে বা রাগী হোক, স্রেফ সন্দেহের শিকার হয়ে, তাকে মারা পড়তে দেওয়া যায় না। ওই অসহায় মেয়েটার ভাগ্যে তখন কী ঘটবে? এ কাজ কার? সত্যি

কোনো মানুষ পিশাচের? না কোনো জন্তু জানোয়ারের? গ্রামের অন্য কোনো শয়তান কি এই কীর্তি করে বুনোর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে? কেউ তো স্বচক্ষে দেখে নি বুনোকে রক্তপান করতে। এখন বুনোকে, তার মেয়েকে, বাঁচাই কী করে! দুই বন্ধু প্রাণপণে বুদ্ধি হাতড়াতে থাকি।

আমি বললাম, পুলিশে খবর দিলে কেমন হয়?

সুনন্দ বলল, কোনো লাভ নেই। গ্রামের ঘরোয়া ব্যাপারে পুলিশ নাক গলাবে না।

বললাম, তবু চেষ্টা করি। যদি যায় পুলিশ, একটু ভয় দেখিয়ে আসে। তাহলে চট করে বুনোর ক্ষতি করতে অন্যেরা হয়তো সাহস পাবে না। ইতিমধ্যে রক্তচোষার ব্যাপারটা থেমে যেতে পারে।

সুনন্দ ঘাড় নাড়ল–যাবে না পুলিশ। স্রেফ গুজব শুনে তিন-চার মাইল পথ ঠেঙিয়ে যেতে রাজী হবে না। উলটে আমাদের ঠাট্টা করবে। হ্যাঁ যাবে, যদি খুনখারাবি কিছু হয়, তারপর।

তখন গিয়ে লাভটা কী হবে ঘোড়ার ডিম!–আমি রেগে বললাম।

তিনজনে চুপচাপ বসে আছি। বুনোকে বাঁচাবার কোনো উপায় আমাদের মাথায় আসছে না। সুনন্দ বলে উঠল, ঠিক আছে, পুলিশ না যাক, আমরা যাব। মাঝেমাঝে ঘুরে আসব ওই গ্রামে। বুনোর খোঁজখবর করব। তাহলে গ্রামের লোক সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু একটা ছুতো চাই। হ্যাঁ, মুরগি। মুরগির খোঁজে যাওয়া যেতে পারে। বুধন, বুনোর মুরগি আছে?

আছে–জানাল বুধন।

–বেশ। আমরা দুজনে কাল মুরগি কিনতে যাব বুনোর কাছে। ওকে বলে রাখিস। আমাদের যেন আবার হাঁকিয়ে না দেয়। ওর ভালোর জন্যেই যাচ্ছি। বাইরের লোক বারবার বুনোর খোঁজে আসছে দেখলে, এখন কেউ ওকে মারবার সাহস পাবে না। কারণ জানে, বুনোর কিছু ঘটলে আমাদের তা নজরে পড়বে এবং ঘটনাটা অস্বাভাবিক মনে হলে পুলিশে খবর যাবে।

আমাদের যুক্তি বুধনের পছন্দ হল। সে খুশিমনে বিদায় নিল।

সুনন্দ মহা উত্তেজিত। এক রহস্যময় রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে সে উৎসাহে টগবগ করতে লাগল। আমার মনেও লাগল তার ছোঁয়াচ। আর তার ফল–কী বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা!

.

দুপুরবেলা। আমি ও সুনন্দ সাইকেলে চেপে মহুয়াডাঙা গ্রামের দিকে চললাম।

আমাদের বাড়ি থেকে শহর ছাড়িয়ে মাইল খানেক গিয়ে ধলভূমগড় যাওয়ার বড় রাস্তা থেকে ডান পাশে এক সরু মেঠো রাস্তা বেরিয়ে গেছে। ওই পথ মাইল দুই দূরে মহুয়াডাঙায় শেষ হয়েছে। পথের দু-পাশে প্রান্তরে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। মাঠে গাছপালা খুব কম। মাঝেমাঝে কয়েকটা শুধু খেজুর তাল বা বাবলা গাছ। আর এক নিঃসঙ্গ প্রাচীন বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। দূর থেকে মহুয়াডাঙা গ্রাম দেখা যায়। গ্রামে অবশ্য বেশ গাছপালা। একটা পুকুর রয়েছে। এমন অসময়ে দুই শহুরে যুবকের আবির্ভাবে গ্রামের লোক অবাক হয়ে গেল।

বুনো মাঝির বাড়ি কোনটা?–জিজ্ঞেস করতেই একজন দেখিয়ে দিল আঙুল বাড়িয়ে। কিন্তু তার চোখের অদ্ভুত চাউনিটা আমাদের নজর এড়াল না।

গ্রামে ঢোকার মুখেই বুনোর বাড়ি। একখানি মাত্র ছোট্ট মাটির ঘর। তাতে খড়ের চাল। তকতকে একফালি উঠোন। একটা প্রকাণ্ড শুয়োর বাড়ির সামনে মাটিতে গড়াচ্ছে। তার গায়ের ওপর চার-পাঁচটা ছানা। ঘরের বাইরে তেতুঁল গাছের ছায়ায় দড়ির খাঁটিয়াতে বুনো বসে ছিল। পাশে তার মেয়ে শুয়ে। সাইকেলটা একটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে আমরা কাছে যেতে বুনো উঠে দাঁড়াল। শুয়োরটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পালাল। পিছনে পিছনে ছুটল তার বাচ্চারা।

বুনোকে প্রথম দর্শনে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। কী দুশমনের মতো চেহারা! রীতিমতো লম্বা। গিঁট পাকানো দেহ। মুখে অজস্র ভাঁজ। কাঁধ অবধি কালো কুচকুচে বাবরি চুল। ছোটছোট চোখ দুটো করমচার মতো লালচে। সে ঘাড় কাত করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

আমি বললাম, তোমার নাম বুনো?

–হ।

সুনন্দ বলল, আমাদের বুধন পাঠিয়েছে। আমরা মুরগি কিনতে এসেছি।

মুরগি মাঠে চরছে। এখন ধরা যাবে না।–বুনোর কণ্ঠস্বর ফাঁসফ্যাসে। ওর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলাম, আমাদের আগমনে মোটেই খুশি হয়নি। নেহাৎ যেন ঠেকায় পড়ে আমাদের উপস্থিতি সহ্য করছে। ওর দাঁতগুলো বড় বড়। চওড়া হাঁ। দেখলেই মনে হয়, লোকটা রাগী বেপরোয়া।

আমি বেশ চটলাম মনে মনে। এমন খুনি চেহারার বেয়াদপ লোকটার নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত হতে ভারি দায় পড়েছে আমাদের। ফিরে যাই। ওর বরাতে যা হবার তোক। আমাদের বয়ে গেছে। কষ্ট করে এলাম এতদূর, এই ঢের। সত্যি কথা বলতে কি,

লোকটাকে দেখে অবধি আমার মন বলছিল, এর দ্বারা যে কোনো ভয়ঙ্কর কাজ সম্ভব। হয়তো গ্রামের লোকের ধারণা ঠিকই। বুধন তার ভাই সম্পর্কে দুর্বল। তাই অন্যদের কথা মানতে চাইছে না।

সুনন্দ কিন্তু বুনোর ব্যবহারে দমল না। দিব্যি খোশমেজাজে বলল, বেশ আমরা আবার পরশুদিন আসব। একটা মুরগি ধরে রাখিস। এখন একটু জল খাওয়া দিকি। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

বুনো নিঃশব্দে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। আমাদের দৃষ্টি পড়ল খাঁটিয়ায় শোওয়া ছোট্ট মেয়েটির দিকে। আহা, মুখখানি কী মিষ্টি! করুণ চোখে অবাক হয়ে দেখছে। একটি পা। তার সরু। অক্ষম। শরীরও খুব রোগা। বড় মায়া হল।

সুনন্দ চাপা স্বরে বলল, অসিত, দেখ, অনেকে লক্ষ করছে আমাদের।

কথাটা ঠিক। আড়াল-আবডাল থেকে অনেকে মেয়ে-পুরুষ উঁকিঝুঁকি মারছিল। তাদের চোখে কৌতূহল।

বুনো জল আনল ঝকঝকে পিতলের ঘটিতে। খেলাম জল। যাবার সময় সুনন্দ চেঁচিয়ে বলে গেল বুনো, আমরা পরশুদিন আবার আসব।

.

প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ফিরে চলেছি। গ্রাম ছাড়িয়ে খানিক গিয়ে এক দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আসার সময় মহুয়াডাঙা থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ দেখেছিলাম। সেই গাছের নীচে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ আকৃতি। পরনে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি ও সাদা পায়জামা। চোখে দূরবিন লাগিয়ে গাছের ডালে না জানি কী দেখছে।

সুনন্দ বলল, প্রতাপ রুদ্র। ঝাউবাংলোতে থাকেন।

আমাদের পাড়ার একেবারে শেষ বাড়িটা হল ঝাউবাংলো। এই নাম স্থানীয় লোকদের দেওয়া। ঝাউবাংলো অন্য বাড়িগুলোর থেকে বেশ খানিক তফাতে। বিরাট কমপাউন্ডওলা বাড়ি। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। ভিতরে প্রচুর গাছপালা। মস্ত লোহার ফটক থেকে বসত বাড়ি অবধি কাঁকর-ফেলা চওড়া রাস্তা। তার দুধারে আছে দুসারি ঝাউগাছ। বোধহয় এই জন্যেই ঝাউবাংলো নামের উৎপত্তি। ও বাড়ির বাসিন্দাদের চিনিনা। শুধু জেনেছি প্রতাপ রুদ্র ওই বাড়ির মালিক। ঘাটশিলার স্থানীয় কাউকে বা কোনো চেঞ্জারকে ঝাউবাংলোয় কখনো বেড়াতে যেতে দেখিনি।

প্রতাপ বাবুকে কয়েকবার মাত্র দেখেছি। খুব ভোরে কালো রঙের থ্যাবড়ামুখো বিশাল এক কুকুর নিয়ে মাঠে বেড়াচ্ছেন। ভদ্রলোকের নিজের চেহারাও চোখে পড়ার মতো। ছ

ফুটের ওপর খাড়া শরীর। দোহারা শক্ত গড়ন। রোদে পোড়া ফর্সা রঙ। মাংসহীন লম্বাটে মুখ। চাপা পাতলা ঠোঁট। টিয়া পাখির মতো বাঁকানো নাকের নীচে পাকানো গোঁফ আর চিবুকে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথায় কাঁচা-পাকা ঘন চুল। পরনে থাকে হাঁটু অবধি ঝুলের। পাঞ্জাবি ও পায়জামা। তার গম্ভীর ধরন দেখলে নিজে থেকে আলাপ করার উৎসাহ জাগে না। শুনেছি, ভদ্রলোক দু বছর হল বাড়িখানা কিনে এখানে বাস করছেন। তবে ঘাটশিলায় থাকেন না প্রায়ই। ওই বাড়িটা আগে ছিল এক জমিদারের সম্পত্তি।

আরও শুনেছি, বাড়িটায় নাকি ছোটখাটো এক চিড়িয়াখানা আছে। কারণ প্রতাপ রুদ্রের পশু পাখির বেজায় শখ। অনেক বিচিত্র জীবজন্তুর ডাক ভেসে আসে বাড়ির ভেতর থেকে। কিন্তু কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়না ভিতরে। প্রতাপ রুদ্র সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল জেগেছিল। কিন্তু মেটাবার সুযোগ পাইনি।

এখানে কী করছেন ভদ্রলোক?–আমি জানতে চাইলাম।

সুনন্দ বলল, মনে হচ্ছে বার্ড-ওয়াচার। পাখি দেখছে। যাদের এই নেশা থাকে, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় পাখির খোঁজে।

–ভদ্রলোক শুনেছি নানারকম জীবজন্তু পোষেন।

হ্যাঁ।–বলল সুনন্দ–ওর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে আছে। ইন্টারেস্টিং লোক।

প্রতাপ রুদ্র একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন আমাদের, তারপর আবার দূরবিন চোখে লাগালেন।

সাইকেলে পাশাপাশি চলেছি। বললাম, হারে সুনন্দ, বুনো লোকটাকে কেমন লাগল? নিরীহ, মানে সত্যি নির্দোষ, মনে হয় কি?

নিরীহ মোটেই না।–সুনন্দ জবাব দিল–তবে দোষী না নির্দোষ এখুনি বলা শক্ত।

অর্থাৎ বুনোর হাবভাবে সুনন্দরও ধোঁকা লেগেছে।

.

বিকেলে খরস্রোতা নদী ধরে অনেক দূর বেড়াতে গেলাম দুজনে। ধলভূমগড়ের রাস্তাকে আড়াআড়িভাবে কেটে খরস্রোতা বয়ে চলেছে। রাস্তা গেছে নদীর ওপর সাঁকো দিয়ে।

ক্ষীণকায় নদীর টলটলে জলে বড়জোর হাঁটু ডোবে। স্ফটিক স্বচ্ছ জলের তলায় নুড়ি-পাথর, বালি, ঝিনুক পরিষ্কার দেখা যায়। কখনো নদীর পারে পারে, কখনো বা ঠাণ্ডা জলের স্রোতে পা ডুবিয়ে অনেকটা হাঁটলাম। ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল।

সাঁকোর কাছাকাছি পৌঁছেছি, একটি লোক দ্রুত পায়ে সাঁকো পেরিয়ে চলে গেল। প্রতাপ রুদ্র। আমাদের তিনি দেখতে পেলেন না।

আমরা লক্ষ করলাম, প্রতাপ বাবু কিছুটা এগিয়ে ধলভূমগড়ের রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামলেন। ওই তো মহুয়াডাঙা গ্রামে যাবার পথ। শর ঝোঁপের আড়াল থেকে দেখলাম সেই দীর্ঘকায় ঋজু দেহ ক্রমে ছোট হয়ে যাচ্ছে। কখনো বা উঁচু ঢিবির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আলো কমে আসায় তাকে বেশি দূর অবধি নজর করতে পারলাম না।

সুনন্দ প্রথমে কথা বলল–কী ব্যাপার! এই সময় ওই দিকে ভদ্রলোক চললেন কোথায়?

ঠাট্টা করলাম–হয়তো নিশাচর পাখির খোঁজে যাচ্ছে। কিংবা সাঁওতাল গ্রামে হাড়িয়া খাবার অভ্যাস আছে।

সাঁকোর রেলিংয়ে আমরা আরও ঘণ্টাখানেক বসে রইলাম। একটার পর একটা গান গাইলাম হেঁড়ে গলায়। শেষে গলা ধরে যেতে চায়ের তাগিদে উঠলাম। প্রতাপ রুদ্র কিন্তু তখনও ফিরলেন না।

.

পরদিন ভোরে বুধন এল। বুধন জানাল, গতরাতে নাকি আবার রক্তচোষার আবির্ভাব ঘটেছিল মহুয়াডাঙায়। এবার সে হানা দিয়েছে ঘরের মধ্যে। তার শিকার এক যুবক। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে দেখে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে অবিকল ওই রকম ক্ষত। তা থেকে রক্ত ঝরছে।

ঘরের দরজা খোলা ছিল?–সুনন্দ প্রশ্ন করে।

–না।

–আর জানলা?

–হ্যাঁ। একটা জানলা খোলা ছিল বটে।

বুনোকে কেউ দেখেছে নাকি কাছে-পিঠে?–আমি জানতে চাইলাম।

–উহুঁ। তবে ঢেঙা বলছে, বুনো কাল রাত অবধি জেগে বসেছিল তার উঠোনে। গাঁয়ের লোক ওকেই সন্দেহ করছে।

বুধন বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইল। বেচারা ভাইয়ের বিপদের আশঙ্কায় বড় মুষড়ে পড়েছে।

সুনন্দ বুধনকে জিজ্ঞেস করল, ওই যে ঝাউবাংলো, ওর মালিককে চিনিস?

–হুঁ। চিনি। লম্বা পারা মানুষ। কুকুর নিয়ে ঘোরে।

–আচ্ছা, ওই বাবু কাল রাতে তোদের গ্রামে গিয়েছিল?

–কই না তো!

–উনি মহুয়াডাঙায় গিয়েছেন কখনো?

–হ্যাঁ। গেছে অনেকবার।

–কী করতে যায়?

–চোখে নল লাগিয়ে পাখি দেখে।

–রক্তচোষার ব্যাপারে কিছু জানেন নাকি?

–তা তো জানিনা বাব। তবে একদিন দূর থেকে দেখেছি, ঢেঙামাঝির সঙ্গে কী সব কথা বলছিল।

বুধন চলে যেতে সুনন্দ বলল, প্রতাপ রুদ্র কাল রাতে মহুয়াডাঙার দিকে গিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামে ঢোকেন নি। কোথায় গিয়েছিলেন তবে? আশ্চর্য!

আমি উত্তর দিলাম–হয়তো মাঠে মাঠে পায়চারি করেছেন। লোকটি বেশ রহস্যময়।

হুঁ।-সুনন্দ একটু মাথা নাড়ে।

তখনও রোদের তেজ বাড়েনি। দুজনে বেড়াতে বের হলাম। ঝাউবাংলোর সামনে দেখি, প্রতাপ রুদ্র প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরছেন। হাতে চেনে বাঁধা সেই বিরাট কুকুর।

সুনন্দ সোজা এগিয়ে গেল ভদ্রলোকের দিকে। অমনি বাঘের মতো কুকুরটা গরগর করে উঠে চেনে টান দিল। থমকে দাঁড়াল সুনন্দ। প্রতাপ রুদ্রকে উদ্দেশ্যে করে বলল, নমস্কার। আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। আপনাকে প্রায়ই দেখি। এটা কী জাতের কুকুর জিজ্ঞেস করব ভাবি।

রুদ্র স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত সুনন্দের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! আবার একটু কৌতুকের আভাস রয়েছে যেন। সুনদর অবস্থা দেখে মজা পেয়েছেন। সুনন্দ কাঠের মতো দাঁড়িয়ে। বারবার আড় চোখে কুকুরটাকে দেখছে।

আপনি কুকুর ভালবাসেন?–ভরাট কণ্ঠস্বর।

–আজ্ঞে হ্যাঁ।

–এটা ম্যাস্টিফ।

ওঃ, দারুণ কুকুর! আচ্ছা আপনি তো অনেক জন্তু-জানোয়ার পুষেছেন, দেখাবেন আমাদের? সুনন্দ আলাপ জমাবার চেষ্টা করল।

প্রতাপ রুদ্রের মুখে কিন্তু কোনো আগ্রহ ফোটে না। আমাদের আর এক প্রস্থ আপাদমস্তক দেখলেন। তারপর বললেন, দেখাতে পারি এক শর্তে।

–কী?

–মাত্র একবার দেখাব এবং আর কাউকে জুটিয়ে আনা চলবে না। কাউকে এ খবর বলাও চলবে না। লোকজন এলে আমার কাজের ক্ষতি হয়।

বেশ তাই হবে।–সুনন্দ তৎক্ষণাৎ রাজি।

আসুন।–প্রতাপ বাবু আহ্বান জানালেন।

নেপালি দরোয়ান গেট খুলে দিল। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। একজন পরিচারক এসে। নীরবে প্রতাপবাবুর কাছ থেকে কুকুরটা নিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল। পরিচারকটি এ দেশীয় নয়। দারুণ যণ্ডামার্কা জোয়ান। কাকর-বিছানো পথ ধরে চলতে চলতে রুদ্র জেনে নিলেন আমাদের পরিচয়।

প্রতাপবার একটু ঠাট্টার সুরে বললেন, আমাদের কালেকশনে কিন্তু বাঘ-সিংহ নেই। সবই ছোট জীবজন্তু। সাধারণত যে সব পশু-পাখি কেউ পোযে না, আমি তাদের পোষ মানাবার চেষ্টা করি। ওদের চরিত্রের খুঁটিনাটি স্টাডি করি।

আমরা বাগানের ভিতরে চললাম। বাগানের এক জায়গায় পর পর পনেরো-ষোলটা বড় বড় খাঁচা। খাঁচাগুলো তারের জালে ঘেরা। মাথায় খড়ের চাল। কোনোটাতে রয়েছে। জন্তু, কোনোটায় পাখি। ঠিক কলকাতা চিড়িয়াখানায় যেমন দেখেছি, তেমনি করে রাখা। হয়েছে জীবজন্তু।

প্রতাপ রুদ্র একটার পর একটা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে চিনিয়ে দিতে লাগলেন। লোকটির চেহারা ও কথাবলার ভঙ্গিতে জোরালো ব্যক্তিত্বের ছাপ।

এক ফাঁকে তিনি বললেন, আমি বয়সে অনেক বড়। আশা করি তুমি বললে আপত্তি নেই।

আমরা সরবে জানালাম–না না আপত্তির কী আছে?

প্রতাপ রুদ্র দেখাতে থাকেন, এই এক জোড়া ডিঙ্গো। অস্ট্রেলিয়ার বুনো কুকুর। কিছুতেই পোষ মানে না। তবে আমি কিছুটা বাগ মানাতে পেরেছি।

তিনি পকেট থেকে বিস্কুট বের করে খাঁচার ভিতর ছুঁড়ে দিলেন। অনেকটা আমাদের দেশি কুকুরের মতো চেহারা। মেটে লাল রঙের ডিঙ্গো দুটো বিস্কুট খেয়ে লেজ নাড়তে লাগল। তারপর রুদ্র দেখালেন, এই হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার কোয়ালা।

প্রাণীটি ঠিক যেন ক্ষুদে ভালুক। রুদ্র বললেন, এ ভাল্লুক নয়। ভাল্লুক স্তন্যপায়ী। এরা মারসিউপিয়ান। অর্থাৎ পেটের তলায় থলিতে বাচ্চা বয়ে বেড়ায়। যেমন ক্যাঙ্গারু।

একটা খাঁচার সামনে দাঁড়াতেই কালো-সাদা নোমওলা বেঁজি জাতীয় দুটো জন্তু দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। রুদ্র বললেন, উড্ডারিন। উত্তর আমেরিকার বেঁজি। খুব হিংস্র।

এরপর দেখলাম, মাদাগাস্কারের লেমুর ও শ্লথ। আফ্রিকার বনবিড়াল। দক্ষিণ আমেরিকার ধেড়ে ইঁদুর এগুটি ইত্যাদি নানা অদ্ভুত জন্তু।

তারপর পাখি। কতরকম রঙবেরঙের পাখি। বেশির ভাগেরই নাম শুনিনি। কোনোটা ভারি সুন্দর শিস দিচ্ছে। গাছের ছায়ায় দাঁড়ের ওপর সরু চেন পা বাঁধা এক কাকাতুয়া বসে ছিল। তার গায়ের পালক ধবধবে সাদা মাথায় হলদে ঝুঁটি। কালো বাঁকা ঠোঁট। আমরা কাছে যেতে চোখ পাকিয়ে তড়বড় করে পরিষ্কার গলায় বলতে লাগল গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। নমস্কার, নমস্কার।

রুদ্র বললেন, ও তাক বুঝে মানুষের ভাষা ব্যবহার করতে শিখেছে।

রুদ্র হাত নাড়তে কাকাতুয়া বলে উঠল, বাই বাই!

সুনন্দ প্রশ্ন করল, মিস্টার রুদ্র, এসব পশু-পাখি আপনি যোগাড় করেন কীভাবে?

–কিনে আনি নানা দেশ থেকে। দু-একটা নিজেও ধরেছি।

আমাদের মাথার ওপর ছোট্ট অদ্ভুতদর্শন একটা কালো রঙের বাঁদর গাছের ডালে লেজ, পাকিয়ে মাথা নিচু করে দোল খাচ্ছিল। তার ভাঁটার মতো চোখ। মস্ত লেজ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোন দেশি বাঁদর?

–বাঁদর নয়। একরকম ভাম। ব্রাজিল থেকে এনেছি। নাম কিংকাজু। এমনি লেজে ঝোলার অভ্যাস একমাত্র সাউথ আমেরিকার প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়।

রুদ্র একবার শিস দিতে কিংকাজুটি তড়াক করে নেমে এসে তার পিঠে চড়ে বসল। পরক্ষণেই লম্বা লাফে গাছে উঠে গেল।

রুদ্র বললেন, আমি দু মাস আগে সাউথ আমেরিকা থেকে ফেরার সময় কতগুলো স্পেসিমেন এনেছিলাম। তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভাল পোষ মেনেছে।

সুনন্দ উসখুস করছিল। এবার কথাটা পাড়ল–মিস্টার রুদ্র, সেদিন আপনাকে মহুয়াডাঙা গ্রামের কাছে দেখলাম; বায়নাকুলার দিয়ে কী যেন দেখছিলেন–

রুদ্র জবাব দিলেন, পাখি দেখছিলাম।

সুনন্দ বলল, জানেন, ওই গ্রামে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে।

কী? রুদ্র ভুরু কোঁচকালেন।

–রাত্তির বেলা ঘুমন্ত লোককে কীসে যেন কামড়াচ্ছে। কী কামড়ায়, যখন কামড়ায়, কেউ টের পায় না ঘুম ভেঙে দেখে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছে। গ্রামের লোক খুব ভয় পেয়ে গেছে।

–কেন?

–ওদের ধারণা অলৌকিক কাণ্ড। মানে কোনো রক্তচোষা পিশাচ বা দানোর কীর্তি।

ও।–সংক্ষিপ্ত উত্তর। প্রতাপ বাবু বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর অন্য কথা কয় করলেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে আর আলোচনা করতে চান না।

সুনন্দ উৎফুল্লভাবে বলল, আপনি বুঝি অনেক দেশ ঘুরেছেন?

–হ্যাঁ, তা ঘুরেছি।

–কোথায় কোথায়?

–ইউরোপের সব জায়গায়। তাছাড়া মিডল-ইস্ট।

–আপনার কাছে গল্প শুনতে আসব কিন্তু।

সরি, এখন নয়। আপাতত কদিন আমি ব্যস্ত আছি।–অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় প্রতাপ বাবু। সুনন্দর আগ্রহকে থামিয়ে দিলেন।

প্রতাপবাবুর ব্যবহার শেষ দিকে বেশ রূঢ় মনে হল। আমাদের বসতেও বললেন না। চিড়িয়াখানা দেখা হয়ে যেতে আবার সোজা গেট অবধি আমাদের এগিয়ে দিলেন।

ফেরার সময় জিজ্ঞেস করলাম, সুনন্দ কী বুঝলি?

–বুঝলাম যে প্রতাপ বাবু মহুয়াডাঙার ঘটনা জানেন। কিন্তু অন্যদের কাছে ফঁস করতে রাজি নন।

দ্বিতীয়ত উনি এখন ব্যস্ত।–আমি মন্তব্য করলাম।

.

পরদিন বাজার থেকে এসে সুনন্দ বলল, বুঝলি অসিত, প্রতাপবাবু সম্পর্কে একটু খোঁজ-খবর করলাম। লোকটির অতীত সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। শুধু জানলাম, উনি

একজন প্রাণিতত্ত্ববিদ এবং অনেক দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন। এখানকার লোকেদের সঙ্গে পরিচয় সামান্য। বিচিত্র স্বভাব। আগের বছর একদল বেদে এসে আস্তানা গেড়েছিল মাঠে। তারা সাপ খেলা দেখাত। নাচগান করত। জড়িবুটি ওষুধ বিক্রি করত। প্রতাপ বাবুর সঙ্গে তাদের বেশ দহরম মহরম হয়। আবার মাস ছয় আগে এক তান্ত্রিক সাধু এসে শালবনের ভিতর কিছুদিন ছিল। তার কাছেও প্রতাপ বাবুকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। তবে লোকটা নাকি পশু-পাখির বিষয়ে একজন এক্সপার্ট। কলকাতা চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট একবার ওর সঙ্গে কয়েকটা জন্তু নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে দেখলাম প্রতাপবাবু ঝাউবাংলো থেকে বেরিয়ে খরস্রোতা নদীর দিকে চলে গেলেন। সঙ্গে কুকুরটা নেই। আমরা নদীর ব্রিজে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। রাত হল। কিন্তু প্রতাপবাবু ফিরলেন না।

সুনন্দ উঠল–চল তো একবার মাঠে।

–প্রতাপ রুদ্রের খোঁজে?

হুঁ–সুনন্দ মহুয়াডাঙার পথে পা চালাল। কিছুটা গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম দুজনে। জনমানবহীন সেই বিশাল আঁধার মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে কেমন গা ছমছম করতে লাগল। চারদিক নিঝুম। থেকে থেকে কোনো রাতজাগা পাখির ক্ষীণ তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যাচ্ছে।

মাথার ওপর অগণিত তারা হিরের কুচির মতো ঝিকমিক করছে। আচমকা কতগুলো শিয়াল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল–হুয়া-হুয়া-হুয়া।

প্রান্তরে কোথাও আলোর চিহ্ন দেখতে পেলাম না। খানিক পরে সুনন্দকে ঠেলা মেরে বললাম, চল ফিরি।

সুনন্দ নীরবে ফিরে চলল।

.

বুধন এল তিনদিন পরে। মহুয়াডাঙায় গতকাল আবার সেই রক্তলোভী নিশাচরের উপদ্রব ঘটেছে। আবার আক্রমণ হয়েছে ঢেঙা মাঝির ওপর।

ঢেঙা এবার শুয়েছিল ঘরের ভিতর। পাশে ছিল তার বউ। বউ-ই আবিষ্কার করে, ঢেঙার গলায় একটা কাটা জায়গা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। ঢেঙা কিন্তু তখন অঘোরে ঘুমচ্ছে। মেঝেয় অনেক রক্ত পড়ে শুকিয়ে গেছে। বেশ অবসন্ন হয়ে পড়েছে ঢেঙা। রক্তপাতের। চেয়ে ভয়েই কাতর হয়েছে বেশি।

বুধন জানাল যে, গ্রামের লোক ক্ষেপে উঠেছে। তাদের মতে, এ নিশ্চয়ই বুনোর প্রতিশোধ। কারণ ঢেঙা ওর নামে মোড়লের কাছে লাগিয়েছিল। বুনোকে খুন করার শলা-পরামর্শ হচ্ছে। বুধন শুনেছে। বুনোর আর নিস্তার নেই।

সুনন্দ জিজ্ঞেস করল, ঝাউবাংলোর বাবু মহুয়াডাঙায় গিয়েছিল নাকি এর মধ্যে?

–হ্যাঁ গিয়েছিল। তবে গাঁয়ে ঢোকেনি। মাঠে ঘুরছিল পাখি দেখতে। পাখি ধরার ফাঁদ পাতছিল গাছে।

–রাতের বেলা গ্রামের ভিতর কোনো বাইরের লোককে দেখা গেছে? সুনন্দ জানতে চাইল।

উঁহু।–বুধন মাথা নাড়ল।

.

আমরা দুজনে সেদিন সকালে মহুয়াডাঙায় এক রাউন্ড টহল দিয়ে এলাম। বুনোর হাবভাব আরও অস্বাভাবিক মনে হল। দুর্দান্ত লোকটা কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে। আড়চোখে কেবল তাকাচ্ছে চারধারে। ছটফট করছে। বারবার তার দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে বারন্দায় চাটাইয়ে শোওয়া তার রুগণ মেয়ের দিকে। সে মুরগি দিল। পয়সা নিল। কিন্তু

কথাবার্তা বলল না। ঠিক যাবার আগে সুনন্দ তাকে বলল, বুনো তোর মেয়েকে হাসপাতালে দে। ও ভালো হয়ে যাবে।

অমনি বুনোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল–হবে? বেশ। আজই দিয়ে দি হাসপাতালে। তুই ঠিক করে দে বাবু।

সুমন্দ বলল, এত তাড়াতাড়ি হবে নারে। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে তোকে জানাব।

বুনো যেন দমে গেল। মনে হল, মেয়েকে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে ফেলতে পারলে ও নিশ্চিন্ত হয়।

মহুয়াডাঙা ছেড়ে চলে আসবার সময় সুনন্দ বলল, লক্ষ করলি, বুনো ভয় পেয়েছে?

উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। হয়তো মেয়ের জন্যেই ওর ভাবনা বেশি। কিন্তু লোকটা সত্যি দে দোষী না নির্দোষ আমি এখনো ঠিক বুঝছি না।

সুনন্দ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে বা নিরপরাধ। তবে

সুনন্দ আর কিছু বলে না।

বিকালে সুনন্দ বলল, মামার চেনা এক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে আসি। স্টেশনের কাছে থাকেন।

আমি গেলাম না। জমাট এক ডিটেকটিভ বই শুরু করেছি। বললাম, আমি মুরগিটা বেঁধে রাখব। তুই ঘুরে আয়।

সুনন্দর ফিরতে রাত আটটা হল। রাতে খাওয়ার পর বারান্দায় বসে গল্প করতে লাগলাম। শুক্লপক্ষ চলছে। কিন্তু একট মেঘ জমেছে। তাই চাঁদের আলো তেমন ফোটেনি। কেমন ঘোলাটে ভাব। অনেক দূরে দূরে। কয়েকটা বৈদ্যুতিক আলো ঝকঝক করছে। আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে মিটমিটে তারা। এমন নিস্তব্ধ রাত কলকাতায় টের পাওয়া যায় না।

আমি বললাম, জানিস সুনন্দ, মহুয়াডাঙার এই রহস্য নিয়ে আমার মাথায় একটা থিওরি এসেছে।

–কী?

–ড্রাকুলা ফিল্মটা দেখেছিস?

–না।

–গল্পটা শুনেছিস?

–হ্যাঁ, শুনেছিলাম। কিন্তু—

বললাম, আমি ড্রাকুলা ফিল্মটা দেখেছি। বইটাও পড়েছি। মনে আছে, রুমেনিয়ার এক জমিদার কাউন্ট ড্রাকুলা ছিল ভ্যাম্পায়ার। অর্থাৎ মানুষরূপী রক্তশোষক প্রেত। সে ঘুমন্ত মানুষের বা মানুষকে সম্মোহন করে তার রক্ত শুষে খেত। মহুয়াডাঙার কেসটা অনেকটা যেন সেই রকম।

সুনন্দ ঝাঁপিয়ে উঠল, দূর-যতসব বাজে সংস্কার। তাছাড়া ড্রাকুলা-ফ্রাকুলা বিদেশি ব্যাপার। এদেশে ড্রাকুলার কথা কখনো শোনা যায়নি।

আমি বললাম, মনে রাখিস, প্রতাপ রুদ্র বহুদিন বিদেশে কাটিয়েছে। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কেউ জানে না। অবশ্য ওই বুনোও ভ্যাম্পায়ার হতে পারে।

সুনন্দ আমার দিকে তাকিয়ে গলা দিয়ে শুধু শব্দ করল, হুম্।

আশ্চর্য ব্যাপার। এর পর সুন্দর কথাটথা কমে গেল। কিছু জিজ্ঞেস করলে হুঁ-হ্যাঁ করে দায়সারা গোছের জবাব দেয়। অন্যমনস্কভাবে মাথার চুল টানছে কেবল। ও লক্ষণ চিনি। সুনন্দর মস্তিষ্কে কোনো চিন্তা ঘুরঘুর করছে। নিশ্চয়ই আমার ডাকুলার আইডিয়াখানা লেগে গেছে। মনে মনে হাসলাম। আমি মোটেই সিরিয়াসলি ডাকুলার কথা ভাবিনি। রহস্য করেছিলাম মাত্র।

পরদিন সকালে চা এবং কিঞ্চিৎ টা গলাধঃকরণ করেই সন হুট করে কোথায় বেরিয়ে ফিরে এল, মিনিট পনের বাদে। জানতে চাইলাম, কোথায় গিয়েছিলি?

–ঝাউবাংলোয়?

–কেন?

–প্রতাপ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

–হল দেখা?

–না। দরোয়ান বলল, বাবু ব্যস্ত আছেন। এখন দেখা হবে না।

কী জন্যে গিয়েছিলি?–আমার মনে একটা সন্দেহ উঁকি দেয়।

ছিল দরকার।–সুনন্দ এর বেশি কিছু বলে না।

–হুঁ, বুঝেছি। প্রতাপ রুদ্র সত্যি সত্যি ড্রাকুলা জাতীয় জীব কিনা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলি। ঠিক আছে, একটা বুদ্ধি দিচ্ছি। শোন এরপর যেদিন দেখা হবে, প্রতাপবাবুকে একটা চকলেট বা বিস্কুট অফার করবি। যদি খেয়ে ফেলে, তবে আমাদের থিওরি টিকল না। আর যদি না খায়, তাহলে ও নির্ঘাৎ রক্তচোষা। কারণ কাউন্ট ড্রাকুলা টাটকা রক্ত ছাড়া কিছু খেত না।

আমার রসিকতায় সুনন্দ কিন্তু একটুও হাসল না। গোমড়া মুখে বসে রইল।

দুপুরে খাবার পর সুনন্দ বলল, অসিত, টেনে ঘুমিয়ে নে। আজ রাতে আর ঘুম নেই বরাতে।

কেন?–আমি চমকালাম।

–কারণ আজ রাতে আমরা প্রতাপ রুদ্রকে ফলো করব।

–অর্থাৎ তোর বিশ্বাস, প্রতাপ রুদ্রই হচ্ছে মহুয়াডাঙার নিশাচর আততায়ী। লোকটা পিশাচ। মানুষের রক্ত চুষে খায়। ধেৎ এই বিজ্ঞানের যুগে এসব ধারণা স্রেফ অচল। আমি তখন তামাশা করছিলাম।

সুনন্দ গম্ভীরভাবে বলল, প্রতাপ রুদ্রের আসল পরিচয় আমি জানি না। প্রমাণ না পেয়ে। আমি কোনো সিদ্ধান্তে আসব না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহুয়াডাঙার রহস্যের পিছনে ওর হাত আছে। কেন উনি প্রায়ই রাতে গ্রামের দিকে যান?

আমি বললাম, যদি আজ রাতে উনি মহুয়াডাঙার দিকে না যান?

–আজ নয়তো কাল যেদিনই যাবে, আমরা প্রতাপ রুদ্রকে ফলো করার জন্যে তৈরি থাকব।

–অর্থাৎ এখন থেকে আমাদের রাতে ঘুমের দফা গয়া। আমার মেজাজ একদম বিগড়ে গেল। কিন্তু সুনন্দ যখন জেদ ধরেছে, ও ঠিক যাবেই। ও যা একরোখা আর ডানপিটে, আমি যেতে না চাইলে একাই যাবে। অথচ ওকে একা ছেড়ে দেওয়াও চলে না।

.

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। নির্জন নদীতটে কতরকম পাখির কাকলি। ঝিরঝিরে বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ। ভারি আরামদায়ক। আমার ও সুনন্দর কিন্তু এসব উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা নয়। ঝোঁপের পিছনে লুকিয়ে অস্থির ভাবে অপেক্ষা করছি– কখন আসবে প্রতাপ রুদ্র।

সহসা দেখলাম সেই দীর্ঘ ঋজু দেহ ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে এই পথে। তার গায়ে কালচে রঙের পাঞ্জাবি ও হালকা হলুদ রঙা পায়জামা।

প্রতাপ রুদ্র ব্রিজ ছাড়ালেন। তারপর খানিক এগিয়ে মাঠে নামলেন। অর্থাৎ আজও তাঁর লক্ষ্য মহুয়াডাঙা। নজর করলাম প্রতাপ বাবুর কাঁধে ঝুলছে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

সুনন্দ বলল, এগিয়ে যাক। বেশ দূর থেকে ফলো করব। নইলে দেখে ফেলতে পারে।

প্রতাপ রুদ্রের চলমান মূর্তি ক্রমে মাঠের মধ্য দিয়ে দূরে সরে যায়। তারপর ঢাল জটি নেমে চোখের বাইরে চলে গেল। তখন আমরা বেরিয়ে এলাম।

পা টিপে টিপে এগোচ্ছি। কখনও ঢিবি বা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সমস্ত পশ্চিম দিগন্তে সিঁদুর-বরন হয়ে উঠল। অপরূপ সেই দৃশ্য। প্রতাপবাবুকে শেষবারের মতো দেখলাম মাঠের মধ্যে সেই যে বিরাট বটগাছটা, তার নীচে। তারপর অদৃশ্য হলেন।

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। বসে রইলাম পাথরের আড়ালে। আবার দেখলাম প্রতাপবাবু আবির্ভূত হয়েছেন।

গাছের কাছে একটা বড় চ্যাটালো পাথর পড়েছিল। বেদির মতো দেখতে। প্রতাপবাবু তার ওপর বসলেন। তার পিঠ আমাদের দিকে। গাছের দিকে মুখ। স্থিরভাবে বসে আছেন। আমরা খানিক কাছে এগিয়ে গেলাম।

অবাক হয়ে দেখলাম প্রতাপবাবু পাথরের ওপর সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। চুপচাপ শুয়ে রয়েছেন নিথর হয়ে। আমরা আর একটু এগোলাম। প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটা পাথরের স্তূপের পিছনে ঘাপটি মেরে বসে খাঁজের ফাঁক দিয়ে লক্ষ রাখলাম প্রতাপ রুদ্রকে।

ক্রমে দিনের আলো একেবারে নিভে গেল। একটির পর একটি তারা জ্বলে উঠল আকাশপটে। ফিকে একটু চাঁদের আলো ফুটল। আবছা দেখা যাচ্ছে চারপাশ। সামনে বটগাছটাকে যেন ঘোর কালো পাথরে তৈরি একটা পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে। তার গায়ে অজস্র জোনাকি পোকার মিটিমিটে আলো ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। বাঁ পাশে দূরে মহুয়াডাঙা গ্রামখানির গাছপালার সীমারেখা আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে। গ্রামে কোনো আলো নেই। ভেসে আসছে না মাদলের আওয়াজ। মানুষের কণ্ঠধ্বনি বা কুকুরের ডাক। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে এক অজানা বিভীষিকায় গোটা গ্রাম যেন বোবা হয়ে গেছে। পাথরের

ওপর শায়িত প্রতাপ রুদ্রকে শুধু অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। ঠিক একই ভাবে তিনি শুয়ে আছেন। কদের মতলব কী? বোধহয় রাত আরও গম্ভীর হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।

ঝিঁঝির একঘেয়ে রব ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। আমরা দুজনে কাঠের মতো বসে থাকি। প্রবল উত্তেজনায় বুকের ভিতর যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে, এবার কী ঘটবে? কী হবে এবার?

বেশিক্ষণ কাটেনি। হঠাৎ এক চিৎকার শুনলাম। মানুষের গলা। কিন্তু অদ্ভুত আওয়াজ। বুঝি রূদ্ধ আক্রোশ এবং আর্তনাদ মিশে আছে সেই স্বরে। তারপরই চ্যাঁ চ্যাঁ করে এক অপার্থিব টানা তীক্ষ্ণ শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল। মনে হল, আমাদের উলটো দিকে প্রতাপবাবুর কাছ থেকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে সেই শব্দের উৎপিত্তস্থ

সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে শব্দ লক্ষ্য করে বেগে ছুটে গেলেন। সুনন্দ আমার হাত ধরে টানল–আয় কুইক।

প্রতাপ রুদ্রের হাতের জোরালো টর্চ জ্বলে উঠল। সেই আলোতে দেখলাম, একটা বড় পাথরের চাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে দানবের মতো একটা মূর্তি। কেশরের মতো ফাঁপানো চুলের রাশি তার মুখের অনেকটা ঢেকে ফেলেছে। ধড়াস করে উঠল হৃৎপিণ্ড। থমকে

দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর চিনতে পারলাম–বুনো। তার হাতে একটা বল্লম। বুনো মাত্র। দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রতাপবাবুও মুহূর্তের জন্য থেমেছিলেন। তারপরই দৌড়ে গিয়ে বুনোর সামনে বসে পড়লেন। আমরাও হোঁচটা খেতে খেতে এগোলাম।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি প্রতাপবাবু মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন আর তার ডান হাতের মুঠোয় ছটফট করছে কী একটা জীব। প্রতাপবাবুর বাঁ হাতের টর্চ আর ডান হাতের ওপর আলো ফেলল। আমি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, আরে, এ যে একটা বাদুড়!

বাদুড়টা ছোট্ট। শিয়ালের মুখের মতো দেখতে তার মুখ। দুটো চকচকে ড্যাবড্যাবে চোখ। খাড়া খাড়া কান। ছুঁচোলো কয়েকটা দাঁত হিংস্রভাবে বেরিয়ে আছে।

প্রতাপবাবু তার ডানা দুটো চেপে ধরেছেন। সে ক্রমাগত মুণ্ডু ঘুরিয়ে কামড়াবার চেষ্টা। করছে। আমাদের দেখে বুনো কর্কশ গলায় বলে উঠল, বাদুড়টো আমার গায়ে বসেছিল।

প্রতাপবাবু চমকে ফিরলেন। তাঁর টর্চের আলো পড়ল আমাদের মুখে–এ কী, তোমরা এখানে!

সুনন্দ উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমরা। আশা করি চিনতে পারছেন। একটু অসময়ে দেখা হয়ে গেল।

তারপর প্রতাপবাবুর স্তম্ভিত দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে সুনন্দ বলল, অসিত, এটা কিন্তু সাধারণ বাদুড় নয়, ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। মিস্টার রুদ্র এবার আপনি

সুনন্দ আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল। রুদ্রের চাবুকের মতো প্রশ্ন তাকে থামিয়ে দিল।

–এটা ভ্যাম্পায়ার ব্যাটু তুমি জানলে কী করে? কে বলেছে?

–অনুমান, মিঃ রুদ্র, অনুমান। কাল অসিত আমায় ড্রাকুলার গল্প শোনাল। বলল। ড্রাকুলার মতো কোনো ভ্যাম্পায়ার নিশ্চয়ই মহুয়াডাঙার লোকের রক্ত শুষে খাচ্ছে। অমনি একটা সম্ভাবনার উদয় হল আমার মনে। ওসব ভুতুড়ে গল্প আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু একটা নতুন ক্লু মাথায় এল। ভূতপ্রেতপিশাচ নয়-বাদুড়। রক্তপায়ী বাদুড়। ভ্যামপায়ার ব্যাট। ভ্যামপায়ার ব্যাটের রক্ত পানের বর্ণনা আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম। মহুয়াডাঙার ঘটনাগুলোর সঙ্গে তা অদ্ভুতভাবে মিলে গেল। স্রেফ দুইয়ে-দুইয়ে চার।

আমি বললাম যাঃ, এখানে ভ্যাম্পায়ার ব্যাটু আসবে কোথা থেকে? ইমপসিবল।

সুনন্দ উত্তর দেয়–জানি, ভারতবর্ষে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট নেই। একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনের জঙ্গলে ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তবে প্রতাপবাবু মাত্র দু মাস আগে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কিছু পশু-পাখি নিয়ে এসেছেন। অতএব এ প্রাণীটি নিশ্চয়ই তাঁর আমদানি। কী, ঠিক বলিনি, মিস্টার রুদ্র?

প্রতাপবাবু স্তব্ধ হয়ে সুন্দর কথা শুনছিলেন। এবার শান্ত কণ্ঠে বললেন, কারেক্ট। তোমার অনুমানের প্রশংসা করি। এর নাম ডেসমোডাস। এক জাতীয় ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। আমি সাউথ আমেরিকা থেকে আনিয়েছিলাম এদের ধরন-ধারণ রিসার্চ করতে।

এরপর সুন্দর মুখ থেকে যে কথাগুলি উচ্চারিত হল, তা শুনে আমি হকচকিয়ে গেলাম।

–মিঃ রুদ্র, আপনি কিন্তু ধরা পড়ে গেছেন। এবার আপনার নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করতে। হবে।

খেলা! নিষ্ঠুর! কী বলছ যা তা?–প্রতাপবাবু রীতিমতো ধমকে উঠলেন।

নির্বিকারভাবে সুনন্দ বলল, কেন না বোঝার কী আছে? অতি সরল বাক্য। আপনি আপনার ওই পোষা জীবটিকে রাতের পর রাত মহুয়াডাঙার নিরীহ লোকদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছেন তার রক্ত-পিপাসা মেটাতে। খেলাটা নিষ্ঠুর বৈকি!

রুদ্রের ঠোঁটে বক্র হাসি জেগে উঠল। ধীর স্বরে বললেন, এবার তোমার অনুমান ফেল করেছেন সুনন্দবাবু। এ বাদুড় আমার পোষ মানেনি আর আমি একে মহুয়াডাঙার মানুষদের ওপর লেলিয়ে দিইনি।

তাহলে রাতে এখানে আসতেন কেন?—সুনন্দর কণ্ঠে অবিশ্বাস।

—আসতাম এই পলাতক জীবটিকে ধরবার উদ্দেশ্যে। একজোড়া ডেসমোডাস এনেছিলাম। একটা মরে গেল, আর একটা খাঁচা থেকে পালাল। কয়েকদিন পরেই মহুয়াডাঙার ঘটনা কানে এল। বুঝলাম ডেস্মোডাসটি এই গ্রামের কাছে আস্তানা গেড়েছে। জায়গাটা পরীক্ষা করে ধারণা হল, এই বটগাছের কোটরে ও আশ্রয় নিয়েছে। গাছের গায়ে জাল খাটালাম। সারা রাত জেগে থাকতাম গাছের কাছে, যদি ফাঁদে পড়ে এই আশায়। অন্য বাদুড়ের মতোই ভ্যাম্পায়ার ব্যাটু সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না। দিনের বেলা অন্ধকার গুহায়, ঘন পাতার ছায়ায় বা গাছের কোটরে লুকিয়ে থাকে। কেবল রাতে বেরোয়। চারদিন আগে বুঝলাম আমার ধারণা সঠিক। কারণ সেদিন সন্ধ্যায় আমি যখন ওই পাথরে বসেছিলাম, বাদুড়টা আমার মাথার ওপর দিয়ে কয়েকবার পাক খেয়ে উড়ে গেল। বোধহয় আমার রক্ত পানের মতলবে ছিল। টর্চের আলোয় তাকে চিনতে অসুবিধা হয়নি। তারপর থেকে একটা হাতে-ছোঁড়া জাল আনতাম সঙ্গে। চুপচাপ পাথরের ওপর শুয়ে টোপ ফেলতাম।

প্রতাপবাবু একটু দম নিলেন। আবার গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, কাল ছুঁড়েছিলাম জাল। একটুর জন্যে ফস্কে গেল। নাউ, আমার মিস্টিরিয়াস মুভমেন্টের কারণ ক্লিয়ার। ওঃ গুডলাক! স্পেসিমেনটা জীবন্ত ধরতে পেরেছি। শুধু একটা ডানা জখম হয়েছে। এই লোকটা কিছু দিয়ে মেরেছে বোধহয়।

প্রতাপবাবু পকেট থেকে একটা ছোট জালের থলি বের করে বাদুডটাকে তার মধ্যে পুরে বন্দি করে ফেললেন ও থলির মুখ চেন টেনে বন্ধ করে দিলেন।

সুনন্দ অপ্রস্তুত সুরে বলল, সরি, প্রতাপবাবু। কিন্তু এই বাদুডের কথা মহুয়াডাঙার লোকদের বলেননি কেন? ওরা কী ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে আছে জানেন।

প্রতাপবাবু বললেন, জানাইনি ভয়ে। জানলে ওরা হয়তো ক্ষেপে গিয়ে হাঙ্গামা বাঁধাত। তার চেয়ে ভয় ছিল, ওরা বাগে পেলে আমার দুর্লভ স্পেসিমেনটিকে মেরে ফেলবে। দিনের বেলা এই বিরাট বটগাছের অগুণতি কোটর হাতড়ে খুঁজে বাদুড়টা ধরা অসম্ভব ছিল। ওঁ বিষধর সাপ থাকতে পারে। তবে গ্রামের লোক বাদুড়কে মারতে চাইলে কোটরে টেরে বাইরে থেকে ফুটন্ত গরম জল ঢেলে দিলেই খতম। তাই চেষ্টায় ছিলাম, নিজেই। গবে কৌশলে। ও যখন রাতে বেরোবে তখন।

–প্রতাপবাবু আপনার ওই মহামূল্যবান স্পেসিমেনটির জন্যে গ্রামের একজন লোক যে প্রাণ হারাতে বসেছে, সে খবর রাখেন? আমি বলে ফেললাম।

সে কী! কে? কেন?–প্রতাপবাবুর চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে।

বুনোর দিকে আঙুল দেখায় সুনন্দ–এই লোকটির বিপদ। গ্রামের লোকের সন্দেহ, ও-ই দানো হয়ে রাত্তিরে মানুষের রক্ত শুষে খাচ্ছে। ওকে খুন করার প্ল্যান হচ্ছে।

বুনো এতক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল। উদগ্রীব হয়ে আমাদের উত্তেজিত কথাবার্তার মর্ম গ্রহণের চেষ্টা করছিল। সে বলে উঠল, বাদুড়টো আমার গায়ে বসেছিল। এক ঝাপ্পড় দিলাম।

আমার মনে এক প্রশ্ন জাগে। জিজ্ঞেস করি, বুনো, এখানে কী করছিলি তুই?

বুনো বলল, পাহারা দিচ্ছিলেম। সেই রক্তখেকো দানোটাকে ধরব বলে। দেখলেম তোরা তিনজনা মাঠের মধ্যে ঘুরছিস। তাই লুকিয়ে নজর রাখছিলেম পাথরের পিছনে শুয়ে।

সুনন্দ বলল, বুনো, দানোটাকে তুই ধরে ফেলেছিস। আসলে দানো পিশাচ নয়। এই বাদুড়টাই আসামি। ও-ই ঘুমন্ত লোকের রক্ত শুষে খায়।

বাদুড় রক্ত খায়?–কথাটা যেন বুনোর বিশ্বাস হল না।

সুনন্দ বলল, দেশি বাদুড় খায় না। এটা বিদেশি বাদুড়। ফল-পাকুড় খায় না। শুধু রক্ত খায়। মানুষ বা পশু-পাখির তাজা রক্ত। মানুষের চামড়া নরম। তাই এরা মানুষের গায়ে দাঁত ফোঁটাতে বেশি পছন্দ করে।

বুনো বিস্ফারিত নেত্রে কয়েক মুহূর্ত দেখল বন্দি বাদুড়টাকে। তার সমস্ত শরীর ফলে ফুলে উঠল। বিকৃত মুখে উন্মত্তের মতো চিৎকার করে ওঠে বুনো, ওটা বাদুড় নয়, শয়তান। শয়তান। ওটাকে আমি মেরে ফেলব। শেষ করে দেব। দে, দে, ওটা দে আমায়।

হাতের বল্লম ফেলে দিয়ে বুনো একলাফে প্রতাপ বাবুর দিকে এগিয়ে গেল। প্রতাপবাবর ডান হাতে বন্দি বাদুড়। তিনি বাঁ হাতে বুনোকে ঠেকালেন। আমি আর সুনন্দও তৎক্ষণাৎ জাপটে ধরলাম বুনোকে।

উঃ, কী প্রচণ্ড জোর লোকটার গায়ে! ঝট্‌কা দিয়ে আমাদের দুজনকে প্রায় ছাড়িয়ে ফেলে সে বারবার প্রতাপবাবর হাত থেকে বাদুড়টা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। আমরা দুজন না আটকালে ও নির্ঘাৎ বাদুড়টা কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলত। ধাক্কা খেয়ে প্রতাপবাবুর হাত থেকে টর্চ খসে পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিলাম টর্চটা।

বুনোর গলা দিয়ে গোঙানির মতো আওয়াজ বের হচ্ছে। অনেকদিনের জমা হওয়া শঙ্কা ও ক্ষোভ যেন ক্রোধের রূপ নিয়ে ফেটে পড়তে চাইছে। আমরা প্রাণপণে বোঝাই—বুনো,

শোন শোন, এই বাদুড়টা আর কোনো উৎপাত করবে না। ওকে খাঁচায় আটকে রাখা হবে। ইত্যাদি।...

তবু বুনোর রাগ পড়ে না। সে কেবলই ফুঁসছে। একটা ধস্তাধস্তি চলতে থাকে। সুনন্দ হঠাৎ বলে উঠল, বুনো শোন, ডাক্তারবাবু বলেছেন তোর মেয়ের চিকিৎসা করবেন। তোর মেয়েকে হাতপাতালে ভর্তি করে নেবেন।

বুনোর বজ্র-কঠিন পেশীগুলি অমনি কেমন শিথিল হয়ে গেল। সব ভুলে গভীর আগ সুনন্দর দিকে চেয়ে সে বলল, আমার মেয়ে ভালো হয়ে যাবে? ডাক্তারবাবু বলেছে?

যাবে বৈকি। নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে।-সুনন্দ আশ্বাস দিল।

কার অসুখ?–প্রতাপবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

–বুনোর মেয়ের। মেয়েটির একটা পা আঘাত লেগে খোঁড়া হয়ে গেছে।

–হুঁ আমি দেখেছি মেয়েটিকে। ভেরি স্যাড কেস।

সুনন্দ বলল, আমার মামার বন্ধু ডাক্তার চ্যাটার্জী বলেছেন, মেয়েটির ট্রিটমেন্ট করবেন। তবে হাসপাতালে রাখতে হবে। তার খরচ আছে। দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়।

রুদ্র বললেন, বুনোর মেয়ের চিকিৎসার সব খরচ আমি দেব। এ আমার ঋণ শোধ। তুমি বুনোকে বলে দাও।

সুনন্দ বুনোকে বলল–শুনলি, বাবু কী বললেন?

বুনো প্রতাপবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। এরপর সে জ্বলন্ত চোখে নিরীক্ষণ করল জালে বদ্ধ বাদুড়টিকে। বিড়বিড় কি যেন বকতে লাগল নিজের মনে। বোঝা গেল। ওই বাদুড়ের ওপর তার রাগ ও বিদ্বেষ কিছুমাত্র কমেনি। বাদুড়ের মালিক সম্বন্ধেও তার মন রীতিমতো সন্দিগ্ধ।

আমি বললাম, বুনো, এই রক্তচোষা বাদুড়ের কথা তুই বলিস নি কাউকে। বরং গ্রামের লোককে জানিয়ে দে, তুই মন্ত্রের জোরে দানোটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিস। তোর খুব খাতির হবে গাঁয়ে।

হুঁ।–বুনো তার আঁকড়া চুলো মাথাখানা কঁকালো অর্থাৎ আমার পরামর্শ তার মনে ধরেছে। সে একবার ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল গ্রামের দিকে। বলে উঠল, যাই মেয়েটা একা রইছে।

মাটি থেকে বল্লমটা কুড়িয়ে নিয়ে বুনো সহসা দৌড়তে শুরু করল।

ম্লান জ্যোৎস্নালোকে উন্মুক্ত প্রান্তরের বুক ছুঁয়ে বুনোর সুদীর্ঘ ছায়ামূর্তি যেন উড়ে চলল। ক্রমে সে হারিয়ে গেল দূর অন্ধকারে।

চ্যাঁ-এ! একটা বিশ্রী চেরা আওয়াজে আমাদের চমক ভাঙল। মহুয়াডাঙার রক্তচোষা তার বন্দিদশার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।